রহমানের বান্দাদের গুণাবলী

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

আবুল কাসেম মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ

সম্পাদনা : নুমান ইবন আবুল বাশার
ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2012 - 1433

IslamHouse.com

صفات عباد الرحمن

« باللغة البنغالية »

أبو القاسم محمد عبد الرشيد

مراجعة: نعمان بن أبي البشر

د/ أبو بكر محمد زكريا

2012 - 1433

IslamHouse.com

রহমানের বান্দাদের গুণাবলী

﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمۡشُونَ عَلَى ٱلۡأَرۡضِ هَوۡنٗا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلۡجَٰهِلُونَ قَالُواْ سَلَٰمٗا ٦٣ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمۡ سُجَّدٗا وَقِيَٰمٗا ٦٤ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصۡرِفۡ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ٦٥ إِنَّهَا سَآءَتۡ مُسۡتَقَرّٗا وَمُقَامٗا ٦٦ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمۡ يُسۡرِفُواْ وَلَمۡ يَقۡتُرُواْ وَكَانَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ قَوَامٗا ٦٧ وَٱلَّذِينَ لَا يَدۡعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقۡتُلُونَ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ وَلَا يَزۡنُونَۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ يَلۡقَ أَثَامٗا ٦٨ يُضَٰعَفۡ لَهُ ٱلۡعَذَابُ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَيَخۡلُدۡ فِيهِۦ مُهَانًا ٦٩ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلٗا صَٰلِحٗا فَأُوْلَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمۡ حَسَنَٰتٖۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٧٠ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا فَإِنَّهُۥ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابٗا ٧١ وَٱلَّذِينَ لَا يَشۡهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغۡوِ مَرُّواْ كِرَامٗا ٧٢ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمۡ لَمۡ يَخِرُّواْ عَلَيۡهَا صُمّٗا وَعُمۡيَانٗا ٧٣ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ أَزۡوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعۡيُنٖ وَٱجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِينَ إِمَامًا ٧٤ أُوْلَٰٓئِكَ يُجۡزَوۡنَ ٱلۡغُرۡفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقَّوۡنَ فِيهَا تَحِيَّةٗ وَسَلَٰمًا ٧٥ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ حَسُنَتۡ مُسۡتَقَرّٗا وَمُقَامٗا ٧٦ قُلۡ مَا يَعۡبَؤُاْ بِكُمۡ رَبِّي لَوۡلَا دُعَآؤُكُمۡۖ فَقَدۡ كَذَّبۡتُمۡ فَسَوۡفَ يَكُونُ لِزَامَۢا ٧٧ ﴾ [الفرقان: ٦٣، ٧٦]

অর্থ:- রাহমান-এর বান্দা তারাই যারা জমীনের উপর বিনয়ী হয়ে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলে তারা বলে ‘সালাম’। এবং যারা রাত কাটায় তাদের রবের উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে। এবং যারা বলে হে আমাদের রব - পালনকর্তা!

আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তিকে সরিয়ে দাও। নিশ্চয় এর শাস্তি নিরবচ্ছিন্ন। বসবাস ও আবাসস্থল হিসেবে এটি কতইনা নিকৃষ্ট! এবং তারা যখন খরচ করে তখন অপচয় করে না , কৃপণতাও করে না বরং এতদুভয়ের মাঝামাঝি ভারসাম্যপূর্ণ এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্যকোন ইলাহের ইবাদত করে না। আল্লাহ যার হত্যা অবৈধ করেছে সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এ কাজ করে তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে। তবে যারা তাওবা করে , ঈমান আনে এবং নেক আমল করে আল্লাহ তাদের অপরাধগুলোকে পূণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যে তাওবা করে ও নেক আমল করে সে সত্যিকার অর্থে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে এবং যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং যখন অর্থহীন ও অনর্থক কাজকর্মের সম্মুখীন হয় তখন নিজ সম্মান-মর্যাদা রক্ষা কের ভদ্রভাবে চলে যায় এবং যাদেরকে তাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হলে বধির ও অন্ধের মত আচরণ করে না। এবং যারা বলে হে আমাদের প্রভু! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে আমাদের চোখের শীতলতাস্বরূপ বানিয়ে দাও এবং আমদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দাও। তাদেরকে তাদের ধৈর্যের

প্রতিদান জান্নাতের কক্ষ প্রদান করা হবে। সেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে। বসবাস ও আবাসস্থল হিসেবে তা কতইনা উত্তম! বল! আমার প্রভু তোমাদেরকে পরোয়া করেন না যদি তোমরা তাকে না ডাক, তোমরা মিথ্যা বলছ। অতএব শীঘ্র তোমরা সম্মুখীন হবে অনিবার্য শাস্তির।’ (৬৩-৭৭ : ফুরকান)

প্রাসঙ্গিক কথা :

সূরা ‘ফুরকান’ মক্কী সূরা। এর আয়াত সংখ্যা ৭৭টি। সুরাটিতে আকীদার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জোর দেয়া হয়েছে। কুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মক্কার মুশরিকদের সন্দেহ ও সংশয়ের অপনোদন করা হয়েছে।

কুরআন মজীদের আলোচনা দিয়েই সূরাটি শুরু হয়েছে। মুশরিকরা কখনো বলতো এটি প্রাচীন যুগের কল্পকাহিনী , আবার কখনো বলতো এটি মুহাম্মদের বানানো কিছু কথা। কখনো বা বলতো এটি তো সুস্পষ্ট যাদু। আল্লাহ তাদের এসব ধারণাকে খন্ডন করে জানালেন যে , এটি তিনিই তাঁর বান্দার উপর নাযিল করেছেন। এটি ফুরকান- সত্য-মিথ্যা ,

ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণকারী। সূরার মাঝে মাঝে আল্লাহর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনা করা হয়েছে কয়েকজন নবী-রাসূলের ও তাঁদের জাতির। নবী-রাসূলদের অবাধ্যতা করায় তাদের যে ভয়াবহ পরিণতি হয়েছিল তার বর্ণনাও দেয়া হয়েছে।

সূরার শেষ দিকে আলোচনা করা হয়েছে আল্লাহর নেক বান্দাহদের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী।

মূল আলোচনা :

সূরায়ে 'ফুরকানে'র শেষ ১৫টি আয়াতে আল্লাহর নেক বান্দাদের গুণাবলী ও তাদের পুরস্কারের আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে পর্যায়ক্রমে আয়াতসমুহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হলো:

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন :

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

শব্দার্থ : عِبَادُ বান্দাগণ (এক বচন عبد বান্দা) الرَّحْمَنِ দয়ালু, করুণাময় يَمْشُونَ তারা চলাফেরা করে الْأَرْضِ পৃথিবী, জমিন هَوْنًا

নম্রতা, বিনয়, خَاطَبَ কথা বলে, সম্বোধন করে الْجَاهِلُونَ মূর্খরা (এক বচন جاهل মূখ) سَلَامًا শান্তি।

‘এবং রাহমান-এর বান্দা তারাই , যারা জমিনের উপর বিনয়ী হয়ে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলে তখন তারা বলে ‘সালাম’।

আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে- وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ রাহমান এর বান্দারা। আরবী ‘ইবাদ’ শব্দটি ‘আবদ’ এর বহুবচন। ‘আবদ’ শব্দটির মূল অর্থ গোলামী ও দাসত্ব করা। আর যে দসত্ব ও গোলামী করে সে হচ্ছে ‘আবিদ’। ‘আবদ’ শব্দটিও এ অর্থে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। মানে আবদ হচ্ছে দাস ও গোলাম। আল্লাহ তাঁর অনুগতদের ‘আবদ’ বলে সম্বোধন করতে ভালবাসেন। কুরআন মজীদে যত জায়গায় ‘আবদ’ ও এর বহুবচন ‘ইবাদ’ শব্দটির ব্যবহার হয়েছে সকল জায়গাতেই আল্লাহর ভালবাসার সুস্পষ্ট ছাপ ফুটে উঠেছে। তিনি তাঁর সবচেয়ে প্রিয় মানুষ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাতটি জায়গায় ‘আবদ’ বলে সম্বোধন করেছেন। কোথায়ও বলেছেন ‘আবদুহু- তাঁর

বান্দা’ কোথাও বলেছেন ‘আবদানা- আমার বান্দা ’। তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকেই আবদ ও ইবাদ বলে সম্বোধন করেছেন। তিনি মুমিনদের সম্পর্কে বলেছেন, ‘ইবাদী- আমার বান্দারা।’ কোথাও তিনি তাদেরকে সম্বোধন করেছেন ‘ইয়া ইবাদী’ বলে- মানে ‘হে আমার বান্দারা’।

সংক্ষিপ্ত এ আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে , ‘আবদ’ ও ‘ইবাদ’ শব্দের ব্যবহার খুবই সম্মানজনক। এর ব্যবহার তাদের জন্যই করা হয় যারা আল্লাহর খুব প্রিয়। এখানে عباد الله আল্লাহর বান্দা না বলে عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ রাহমান এর বান্দা বলার কারণ , সম্ভবত এটি যে , এর দুই আয়াত আগে আল্লাহ এরশাদ করেছেন :

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسۡجُدُواْ لِلرَّحۡمَٰنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحۡمَٰنُ﴾ [الفرقان: ٥٩]

‘যখন তাদেরকে বলা হলো রাহমান-এর উদ্দেশ্য সিজদা কর। তখন তারা বলল, রাহমান আবার কী?

কাফির- মুশরিকরা আল্লাহকে ‘রাহমান’ হিসেবে মানতে অস্বীকৃতি জানালে আল্লাহ এখানে তাঁর প্রিয় বান্দাদের পরিচয় দিলেন عباد الرحمن রাহমান এর বান্দা হিসেবে।

এখানে মুমিনদের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য আলোচনার শুরুতে মুমিনদের পরিচয়ে বলা হয়েছে ‘ইবাদুর রহমান- রাহমান-এর বান্দাগণ’। আয়াতের এ অংশের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী বলেন,

لما ذكر جهالات المشركين وطعنهم في القرآن والنبوة ذكر عباده المؤمنين وذكر صفاتهم وأضافهم إلى عبوديته تشريفا لهم كما قال: سبحان الذي أسرى بعبده فمن أطاع الله وعبده وشغل سمعه وبصره ولسانه وقلبه بما أمره فهو الذي يستحق اسم العبودية ومن كان بعكس هذا شمله قوله تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل.

(ইতোপূর্বের আয়াতগুলোতে) মুশরিকদের অজ্ঞতা এবং কুরআন ও (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) নবুওয়াতকে আক্রমণ বিষয়ের আলোচনার পর (আল্লাহ) তাঁর মুমিন বান্দা ও তাদের গুণাবলীর আলোচনা করেছেন এবং তাদের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা দেখিয়ে তাদেরকে নিজের বান্দাহ হিসেবে অভিহিত করেছেন, যেমনটি তিনি (তাঁর রাসূল সম্পর্কে) বলেছেন, ‘পবিত্র ঐ সত্তা যিনি তাঁর বান্দাকে রাতের বেলায় ভ্রমণ করিয়েছেন।’ যে আল্লাহর আনুগত্য করে, তাঁর দাসত্ব করে এবং কান, চোখ, জিহবা ও হৃদয়কে আল্লাহ যে বিষয়ে আদেশ করেছেন সে বিষয়ে ব্যস্ত রাখে, ‘বান্দা’ নামটির প্রয়োগ তার

ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আর যে এর বিপরীত সে আল্লাহর বাণী 'তারা চতুষ্পদ জন্তু। শুধু তাই নয়, বরং তার চেয়েও অধম' এর অন্তর্ভুক্ত।

(তাফসীরে কুরতবী, খ: ১৩, পৃ: ৬৭)

বুঝা গেল সকল মানুষ এমনকি সকল মুমিন আল্লাহর বান্দা নয়। আল্লাহর বান্দা তারাই যারা কান , চোখ, মুখ ও অন্তর দিয়ে আল্লাহর বিধান মানে। যারা আল্লাহর যথাযথ আনুগত্য ও দাসত্ব করে। আর আল্লাহর বান্দা হওয়া সত্যিই সম্মানের ও বড় ভাগ্যের ব্যাপার। আল্লাহর বান্দাহদের অনেক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য হলো :

يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا .

'তারা জমীনের উপর বিনয়ী হয়ে চলাফেরা করে।'

هون শব্দটির অর্থ প্রশান্ত , ধীরস্থিরতা, নিরহংকারিতা। আল্লাহর প্রিয় বান্দা যখন হাঁটবে তখন সে বিনয়ী হয়ে হাঁটবে। তার পথ চলায় থাকবে না কোন ধরণের অহংকার ও আত্মম্ভরিতা।

আল্লামা ইবনে কাসীর বলেছেন :

أي بسكينة ووقار من غير جبرية ولا استكبار.

অর্থাৎ প্রশান্তি ও আত্মমর্যাদার সাথে , দম্ভ ও অহংকারের সাথে নয়। (তাফসীরে ইবন কাসীর, খ: ৩, পৃ: ৩৩৪)

তবে এর অর্থ এ নয় যে , অসুস্থ ও দুর্বল রোকের মত পথ চলবে। আত্মমর্যাদার সাথে বিনয়ী হয়ে হাঁটা চলা আর কৃত্রিম বিনয় এক জিনিস নয়। কৃত্রিম বিনয়কে ইসলাম অপছন্দ করে। বরং এটিও এক ধরনের রিয়া অর্থাৎ প্রদর্শনেচ্ছা।

ওমর রা. এক যুবককে দেখলেন যে , সে খুবই আস্তে আস্তে হাঁটছে। তিনি তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন যে , তোমার হয়েছে কী ? তুমি অসুস্থ? যুবকটি বলল, না, হে আমীরুল মুমেনীন। ওমর রা. তাকে বেত্রাঘাত করে জোরে হাঁটার আদেশ করলেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, খ: ৩, পৃ: ৩৩৪)

যিনি রাহমান-এর বান্দা হবেন তিনি বিনয়ী হয়ে হাঁটা-চলা করবেন। তবে তার এ বিনয়ে আত্মমর্যাদা থাকবে। থাকবে না অহংকার ও দম্ভ।

অনুরূপ থাকবে না কোন ধরনের দুর্বলতা ও হীনতা। আল্লাহ দম্ভভরে পথ চলতে নিষেধ করেছেন।

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴿37﴾

'জমীনে দম্ভভরে পদচারণা করো না। নিশ্চয় তুমি তো কখনো জমীনকে বিদীর্ণ করতে পারবে না। এবং উচ্চতায় কখনো পাহাড়সম হতে পারবে না।' (৩৭ : বনী ইসরাঈল)

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿18﴾

'জমীনে গর্বভরে পদচারণা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ দাম্ভিক-অহংকারীকে পছন্দ করেন না।' (১৮: লোকমান)

আল্লাহর প্রিয় বান্দার পথচলায় কোন ধরনের দম্ভ ও অহংকার থাকবে না। অনুরূপ থাকবে না কোন ধরনের হীনমন্যতা , ভীরুতা ও জড়তা। বরং তার মধ্যে থাকবে বিনয় , শালীনতা আত্মমর্যাদা। এটি রহমান-এর বান্দাদের প্রথম বৈশিষ্ট্য।

তাদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো-

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا .

'তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলবে, তখন তারা বলবে 'সালাম'।

আল্লাহর বান্দা বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদার সাথে পথ চলবে। পথ চলতে গিয়ে মূর্খ ও নির্বোধদের সাতে কোন ধরনের আলোচনায় জড়িয়ে নিজের সময় নষ্ট করবে না। তাদের সাথে কোন ধরনের বিতর্কে জড়িয়ে পড়বে না। যদি এ ধরনের কেউ গায়ে পড়ে তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় এবং তাকে কোন ধরনের মন্দ কথা বলে , সে তাকে অনুরূপ মন্দ বলবে না, বরং বলবে 'সালাম'। এ সালামের অর্থ কী?

তাফসীরে ফতহুল কাদীরে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

لَيْسَ هَذَا السَّلَامُ مِنَ التَّسْلِيمِ إِنَّمَا هُوَ مِنَ التَّسَلُّمِ تَقُولُ الْعَرَبُ سَلَامًا: أَيْ: تَسَلُّمًا مِنْكَ، أَيْ: بَرَاءَةً مِنْكَ.

এই 'সালাম' অর্থ সালাম দেয়া নয় বরং এর অর্থ নিরাপদে এড়িয়ে যাওয়া। আরবরা বলে থাকে 'সালাম'- মানে আমি তোমার থেকে দূরে সরে পড়লাম। (ফতহুল কাদীর, খ: ৪, পৃ: ৮৫)

ইমাম ইবনে কাসীর আয়াতের এ অংশের ব্যাখ্যায় বলেন-

إذا سفه عليهم الجهال بالقول السيء لم يقابلوهم عليه بمثله بل يعفون ويصفحون ولا يقولون إلا خيرا.

মূর্খ ও নির্বোধরা যদি আল্লাহর বান্দাদের সাথে মন্দ কথা বলে, আল্লাহর বান্দারা তাদের সাথে অনুরূপ মন্দ কথা বলে না। বরং ক্ষমা করে দেয় ও তাদের প্রতি উদারতা দেখায়। মন্দ কথার পরিবর্তে তারা বরং ভাল কথাই বলে।

এরপর ইমাম ইবনে কাসীর ইমাম আহমাদের সূত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হলো : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এক লোক আরেক লোককে গালি দিল। যাকে গালি দেয়া হলো সে গালি দেয়া লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বলল , তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : 'তোমাদের দু'জনের মাঝে একজন ফেরেশতা অবস্থান করছিলেন। যখনি এ লোকটি তোমাকে গালি দিচ্ছিল ফেরেশতা তোমার পক্ষ হয়ে তাকে বলছিলেন বরং এ গালি তোমারই প্রাপ্য। আর যখন তুমি তাকে বললে, তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক তখন তিনি (ফেরেশতা)

বললেন, না বরং শান্তি তোমারই উপর বর্ষিত হোক। শান্তি তোমারই প্রাপ্য।’

(তাফসীরে ইবন কাসীর, খ: ৩, পৃ: ৩২৪-৩২৫)

আল্লাহর বান্দা মূর্খ ও নির্বোধ লোকদের সাথে নিজ থেকে তো কোন ধরনের বাক-বিতন্ডায় জড়াবে না , এমনকি তারা যদি গায়ে পড়ে তার সাথে ঝগড়া করে তার সাথে অশালীন কথা বলে অভদ্র আচরণ করে , তাহলে এ ক্ষেত্রে তার করণীয় হলো তাদেরকে এড়িয়ে চলা। আর এ এড়িয়ে চলা মোটেই দুর্বলতা প্রদর্শন নয় , বরং এর মাধ্যমে সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা পায় আর অনর্থক সময় নষ্ট হয় না। আল্লাহ তাঁর সর্বাধিক প্রিয় বান্দাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ হেদায়েতই দিয়েছিলেন :

وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴿10﴾

‘তারা (কাফেররা) যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সুন্দরভাবে তাদেরকে পরিহার করে চল।’ (১০ : মুযযাম্মিল)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ যে হেদায়েত দিয়েছেন , তা তার অনুসারীদের জন্যও প্রযোজ্য। তাই যারাই আল্লাহর পথে চলে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়ার মর্যাদা অর্জন করতে চায় , তারা তাদের বিরোধীদের কঠোর সমালোচনা , অপবাদ, নিন্দা, অশালীন কথা , বিদ্রূপ, সাজানো ভিত্তিহীন কথায় ধৈর্য ধারণ করবে ও তাদের এ ধরনের আক্রমণকে এড়িয়ে চলবে।

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿ 64﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿65﴾ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

শব্দার্থ : يَبِيتُونَ তারা রাত কাটায় لِرَبِّهِمْ তাদের প্রভুর উদ্দেশ্যে سُجَّدًا সেজদাবনত হয়ে قِيَامًا দাঁড়ানো অবস্থায় يَقُولُونَ তারা বলে, رَبَّنَا হে আমাদের পালনকর্তা اصْرِفْ সরিয়ে দাও عَذَابَ শাস্তি غَرَامًا অবিচ্ছিন্ন سَاءَتْ মন্দ হয়েছে مُسْتَقَرًّا অবস্থান স্থল مُقَامًا অবস্থান স্থল।

‘এবং যারা রাত কাটায় তাদের রবের উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয়েও দাঁড়িয়ে এবং যারা বলে, হে আমাদের রব- পালনকর্তা! আমাদের থেকে

জাহান্নামের শাস্তিকে সরিয়ে দাও। নিশ্চয় এর শাস্তি নিরবচ্ছিন্ন। বসবাস ও আবাসস্থল হিসেবে এটি কতইনা নিকৃষ্ট!'

এ আয়াতগুলোর বক্তব্যের সাথে পূর্ববর্তী আয়াতের বক্তব্যের সম্পর্ক বিষয়ে শহীদ সাইয়্যেদ কুতুব রহ. বলেন-

هذا نهارهم مع الناس، فأما ليلهم فهو التقوى، ومراقبة الله، والشعور بجلاله، والخوف من عذابه.

এতো তাদের (আল্লাহর বান্দাদের) দিনের বেলায় মানুষের সাথে সম্পর্ক। আর তাদের রাতের বেলা- তা তো কাটে আল্লাহভীতি , আল্লাহ (তারেদ সবকিছু) পর্যবেক্ষণ করছেন- এ অনুভূতি , আল্লাহর মহত্ত্বের অনুভূতি ও তার শাস্তি থেকে ভয়- ভীতির মাধ্যমে।

(ফী যিলালিল কুরআন, খ: ৫, পৃ: ২৫৭৮)

এ আয়াতগুলোতে রাহমান- এর বান্দাদের দু 'টি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হলো তারা সেজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাত কাটায়। আরেকটি হলো তারা জাহান্নামের শাস্তি থেকে আল্লাহর কাছে পরিত্রাণ চায়।

‘এবং যারা রাত কাটায় তারেদ ‘রব’ (প্রভুর) উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে। ’ তাদের দিনের বেলা কাটে আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে। বিনয়ের মাধ্যমে তারা রাতও কাটায় আল্লাহর অনুগত হয়ে। সিজদার মাধ্যমে। আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে থেকে। সিজদা ও দাঁড়ানো বলতে নামায বুঝানো হয়েছে। সরাসরি নামায না বলে সিজদা ও দাঁড়ানো বলা হল কেন? এ প্রসঙ্গে শহীদ সাইয়্যেদ কুতুব রহ. বলেন :

সালাত (নামায)- এর পরিবর্তে সিজদা ও দাঁড়ানো বলা হয়েছে। রাতের গভীরে মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন রাহমান- এর বান্দাদের নড়াচড়াকে চিত্রায়িত করার জন্য। এরা এমন লোক যারা তাদের প্রভুর উদ্দেশ্যে সিজদা করে ও দাঁড়িয়ে রাত কাটায়। তাদের লক্ষ্য একমাত্র তাদের রব। শুধু তাঁর উদ্দেশ্যেই তারা দাঁড়ায়। শুধু তার জন্যই তারা সিজদাবনত হয়। তারা এমন লোক যারা সুখের নিদ্রা বাদ দিয়ে তারচেয়েও বেশি সুখ ও মজার বিষয় নিয়ে ব্যস্ত।

তারা তাদের প্রভুর প্রতি একনিষ্ঠ হওয়াতে ব্যস্ত। তারা তাদের আত্মা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হতে ব্যস্ত। মানুষ ঘুমায় অথচ তারা দন্ডায়মান ও সিজদাবনত। মানুষ ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থান করছে অথচ

তাদের দৃষ্টি মহিমান্বিত করুণাময়ের আরশের দিকে। (ফী যিলালিল কুরআন, খ: ৫, পৃ: ২৫৭৮)

বান্দা নানামুখী কর্মব্যস্ততার মধ্যদিয়ে দিনের সময় কাটাবে। রাতের নিস্তব্ধতায় তার মহান প্রভুর সামনে একাগ্রচিত্তে দাঁড়াবে। তাঁর সামনে মাথা নত করবে। তাঁকে সিজদা করবে। এটি আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় এ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে :

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿16﴾

‘তাদের পার্শ্বদেহ বিছানা থেকে আলাদা থাকে। তারা তাদের প্রভুকে ডাকে ভয়ে ও আশায় এবং আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে।’ (১৬ : সিজদা)

أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ (سورة الزمر 9 :)

‘যে ব্যক্তি রাতের বেলা সিজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে ইবাদত করে ,
পরকালকে ভয় করে এবং তার রবের রহমত প্রত্যাশা করে (সে কি
তার সমান যে এরূপ করে না)।’ (৯: যুমার)

كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿17﴾ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿18﴾

‘তারা তাদের সামান্য অংশই নিদ্রা যেত। রাতের শেষ প্রহরে তারা
(আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করত।’ (১৭-১৮ : যারিয়াত)

রাতের বেলা ঘুম থেকে উঠে নামায পড়া , গুনাহ থেকে ইস্তিগফার করা
(ক্ষমা চাওয়া) , কান্নাকাটি করা আল্লাহর কাছে খুবই প্রিয়। রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেন :

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴿79﴾

‘রাতের কিছু অংশ কুরআন পাঠসহ জাগ্রত থাক। এটি তোমার জন্য
অতিরিক্ত। তোমার রব-প্রভু তোমাকে উত্তম মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করবেন।’
(৯৭ : বনী ইসরাঈল)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিত রাত্রে জাগতেন ও নামায আদায় করতেন। এ প্রসঙ্গে আয়শা রা. বলেছেন :

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له لم تصنع هذا يا رسول الله؟ وقد غفرلك ما تقدم من ذنبك وما نأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا. (متفق عليه)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলায় নামাযে (এত দীর্ঘ সময়) দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, তার পা দু'টো যেন ফেটে যেত। আমি তাকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এমনটি করছেন কেন? অথচ আপনার পূর্ব ও পরের সব গুনাহ মাফ হয়ে গিয়েছে। তিনি বললেন, 'আমি কি (আল্লাহর) কৃতজ্ঞ বান্দাহ হব না?' (বুখারী ও মুসলিম)

রাতের নামাযের ফজীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে অনেক হাদীস আছে। এখানে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. (رواه مسلم)

আবু হোরাইরা রা. থেকে বর্ণিত , রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'রমযানের পর সর্বোত্তম রোযা আল্লাহর মাস মহররমে রোযা ও ফরজ নামাযের পর সর্বোত্তম নামায রাতের নামায।' (মুসলিম)

عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. (رواه الترمذي)

আবদুল্লাহ ইবন সালাম থেকে বর্ণিত যে , রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'হে লোকসকল! তোমরা সালামের প্রসার ঘটাও , খাবার খাওয়াও, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা কর এবং মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন নামায পড়। (এগুলো করে) তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ কর।' (তিরমিযী)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. (روا أبوداود)

আবু হোরাইরা রা. থেকে বর্ণিত যে , রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ‘আল্লাহ করুণা করুন ঐ ব্যক্তির উপর, যে রাতে উঠে নামায পড়ে এবং তার স্ত্রীকে জাগিয়ে দেয়। স্ত্রী যদি উঠতে না চায় তাহলে তার মুখমন্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয়। আল্লাহ করুণা করুন ঐ নারীর প্রতি, যে রাতে উঠে নামায পড়ে এবং তার স্বামীকে জাগিয়ে দেয়। স্বামী যদি উঠেতে না চায় তাহলে তার মুখমন্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয়।’ (আবু দাউদ)

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. أو قال : في أذنه. (متفق عليه)

ইবন মাসউদ থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এমন একজন লোকের আলোচনা করা হল যে , ব্যক্তি সকাল পর্যন্ত ঘুমায়। তিনি বললেন, ‘এ লোকটি তো এমন লোক, শয়তান যার কানে প্রস্রাব করেছে। (বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর প্রিয় বান্দারা পুরো রাত ঘুমিয়ে কাটায় না। তারা ঘুমায় ঘুম থেকে উঠে আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে যায়। নামায পড়ে। বিনয়ী হয়ে

আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে। রাতে যে কোন সময় নামায পড়া যায়। তবে সর্বোত্তম সময় হচ্ছে রাতের শেষ তৃতীয় প্রহর। এ অংশটি খুবই মর্যাদার। রাতের এ অংশ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

إن فى الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والأخرة إلا أعطاه إياه. (رواه مسلم عن جابر رضي الله)

'রাতে এমন একটি সময় আছে যে সময়টিতে কোন মুসলমান ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কোন কল্যাণ চাইলে আল্লাহ তাকে সেটি প্রদান করেন।' (মুসলিম)

আর এ পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ সময়টি হচ্ছে শেষ তৃতীয় প্রহর।

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينتزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : من يدعونى فأستجيب له، من يسألنى فأعطيه، من يستغفرني فأغفرله. (رواه البخاري)

হযতর আবু হোরাইরা রা. থেকে বর্নিত যে , রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ''আমাদের মহান প্রভু প্রতিরাতে নিচের আকাশে

অবতরণ করেন , যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকী থাকে। তিনি বলেন, কে আছ আমাকে ডাক , আমি সাড়া দেব। কে আছ আমার কাছে চাও, আমি তাকে (যা চায় তাই) দেব। কে আছ আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি তাকে ক্ষমা করব।' (বুখারী)

যে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে চায় , সে এমন মর্যাদাপূর্ণ সময়ে ঘুমিয়ে থাকতে পারে না। বিশ্ব জাহানের মালিক ও প্রভু যখন পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করে তার বান্দাদের ডেকে ডেকে তাঁর কাছে চাইতে বলে , তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলে আর তিনি তাদের আশ্বস্ত করেন যে, তিনি বান্দার ডাকে সাড়া দেবেন, যা চায় তাই দেবেন, ক্ষমা করে দেবেন, তখন তাঁর কোন বান্দা কি ঘুমিয়ে থাকতে পারে?

রাহমান- এর বান্দারা এ সময়ে উঠবে। তাদের প্রভুর উদ্দেশ্যে দাঁড়াবে। সেজদাবনত হবে। তাঁকে ডাকবে। তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেবেন। তাঁর কাছে দুনিয়া-আখিরাতের সকল ধরনের কল্যাণ চাইবে , তিনি তাদেরকে তা দেবেন। সকল ধরণের গুনাহ , ভুল-ত্রুটি থেকে ক্ষমা চাইবে। তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। রাহমান- এর বান্দা হঠাৎ

করে কোন এক রাতের শেষ তৃতীয়াংশে নয় বরং প্রতিরাতেই জাগবে। কেননা তার প্রভু তো প্রতিরাতেই নিচের আকাশে অবতরণ করেন আর ডাকেন কে আছো আমাকে ডাক , আমি সাড়া দেব। কে আছো আমার কাছে চাও, আমি দেব। কে আছো আমার কাছে ক্ষমা চাও , আমি ক্ষমা করে দেব।

রাহমান- এর বান্দারা রাতে উঠে তাদের প্রভুর সামনে দাঁড়ায়। তাঁকে সিজদা করে। শুধু তাই নয়, তারা বলে, ‘হে আমাদের রব- পালনকর্তা। আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তিকে সরিয়ে দাও।’

তারা তাদের মহান প্রভুর একান্ত অনুগত হওয়া সত্ত্বেও জাহান্নামের শাস্তিকে তারা ভয় পায়। তারা জাহান্নাম কখনো দেখেনি। তবু তারা জাহান্নাম বিশ্বাস করে। জাহান্নামের কঠিন ও নির্মম শাস্তিকে বিশ্বাস করে। তাদের মহান প্রভুর মহান কিতাবে জাহান্নামের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, সে চিত্র তাদেরকে ভীত- সন্ত্রস্ত করে তোলে তাই তারা ফরিয়াদ জানায়, ‘হে আমাদের প্রভু! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তিকে সয়য়ে দাও।’ তারা বলে, ‘আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর। ’ তারা বলে, ‘ হে আল্লাহ জাহান্নামের শাস্তি থেকে তোমার আশ্রয় চাই।’

আল্লাহর সত্যিকার বান্দা কখনো নিজের নেক আমলের উপর নির্ভর করে নিজেকে জাহান্নাম থেকে নিরাপদ মনে করে না। তার বিশ্বাস সে যতই নেক আমল করুন, এ নেক আমলের পরিমাণ যত বেশিই হোক না কেন আল্লাহর অনুগ্রহ ও মেহেরবাণী ছাড়া জাহান্নাম থেকে বাঁচা সম্ভব নয়। তাই সে আল্লাহর একান্ত অনুগত হয়েও জাহান্নামের কঠিন শাস্তিকে ভয় পায়। জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর আশ্রয় চায়। জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে।

মুমিন আল্লাহর কাছে যতটা জান্নাত পেতে চায় তার চেয়ে অনেক বেশি চায় জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচতে। কুরআন মজীদে মুমিনকে জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য দোয়ার ভাষা সেখানো হয়েছে , কোথাও জান্নাত (বেহেশত) চাওয়ার দেওয়া শেখানো হয়নি।

আলোচ্য আয়াতে বলেছে,

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ

‘হে আমাদের প্রভু! জাহান্নামের আযাবকে আমাদের থেকে সরিয়ে দাও।’

অন্য জায়গায় বলা হয়েছে,

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار .

‘হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দাও , আখিরাতেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর।’

এখানে লক্ষণীয় যে , প্রথম আয়াতটিতে বলা হয়েছে ‘জাহান্নামের আযাবকে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে দাও। ’ মানে আমাদেরকে এভাবে চলার যোগ্যতা দাও যেন আমাদের অবস্থান পর্যন্ত জাহান্নাম এগিয়ে আসতে না পারে। জাহান্নাম যেন আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে থাকে। আমরা যেন জাহান্নাম থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে পারি।

আর দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ‘আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর।’ মানে আমরা যদি অসতর্ক হয়ে পথ চলতে চলতে জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছে যাই , তুমি এ অবস্থায় আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা কর। তুমি যদি রক্ষা না কর, তাহলে জাহান্নাম থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও জাহান্নাম থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনার জন্য দোয়া শিখিয়েছেন এবং নামাযে তাশাহ্হুদের পর এ দোয়া পড়ার জন্য তাকীদ দিয়েছেন।

اللّٰهُمَّ إنى أعوذبك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال.

'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নামের শাস্তি থেকে , কবরের আযাব থেকে। জীবন ও মৃত্যুর কষ্ট থেকে এবং দাজ্জালের সংকটের অনিষ্টতা থেকে।' (মুসলিম)

মুমিন জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য শুধু মাত্র দোয়াই করবে না , সে কর্মের মাধ্যমে নিজকে ও নিজ পরিবারের লোকদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে। এ বিষয়ে আল্লাহ মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿6﴾

‘হে ঈমানদারগণ তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে (জাহান্নামের) আগুন থেকে রক্ষা কর , যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর , যার উপর বসে আছে নির্মম কঠোর ফেরেশ্তাগণ , আল্লাহ তাদেরকে যে আদেশ করেন তারা তা অমান্য করে না এবং তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তারা তাই করে।’ (৬ : তাহরীম)

রাহমান- এর বান্দাগণ, নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট থাকে। তার পরও তাদের মনে ভয় ও শঙ্কা থেকেই যায়। তাই তারা রাতের শেষ প্রহরে উঠে প্রভুর উদ্দেশ্যে দাঁড়ায়, সিজদা করে আর জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য তাঁর মহান দরবারে আকুতি জানায়। সে স্বচক্ষে জাহান্নাম দেখেনি। তবে সে কুরআন মজীদ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহতে জাহান্নামের চিত্র দেখেছে। জাহান্নামের যে ভয়াবহ চিত্র তার সামনে ফুটে উঠেছে তাতে তার এ বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে যে, জাহান্নামের শাস্তি নিরবচ্ছিন্ন। জাহান্নাম খুবই নিকৃষ্ট আবাস।

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا .

শব্দার্থ : وَالَّذِينَ এবং যারা أَنْفَقُوا তারা খরচ করে لَمْ يُسْرِفُوا তারা অপচয় করে না لَمْ يَقْتُرُوا তারা কৃপণতা করে না। بَيْنَ মাঝে قَوَامًا ভারসাম্যপূর্ণ।

'এবং তারা যখন খরচ করে তখন অপচয় করে না, কৃপণতাও করে না বরং (তাদের খরচ হয়) এতদুভয়ের মাঝে ভারসাম্যপূর্ণ।'

রাহমানের বান্দাগণ দাঁড়িয়ে ও সিজদাবনত হয়ে রাত কাটাবে। জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য তাঁর কাছে ফরিয়াদ করবে। এর অর্থ এই নয় যে, সে দুনিয়া বিমুখ হবে। অর্থ সম্পদের প্রতি তার কোন আগ্রহ থাকবে না, সে দুনিয়াদারী মনে করে এগুলোকে এড়িয়ে চলবে। আল্লাহর সত্যিকার বান্দাগণ আল্লাহর সাথে মজবুত সম্পর্ক রাখবে , জাহান্নামের ব্যাপারে তাদের মনে ভয় ও শংকা থাকবে। কিন্তু তারা দুনিয়া বিমুখ হবে না। তাদেরকে আল্লাহ যে অর্থ- সম্পদ দিয়েছেন , সে অর্থ সম্পদের ক্ষেত্রে তারা আল্লাহর হেদায়েত অনুসরণ করবে। তাদের মালিকানাধীন অর্থ-সম্পদের ক্ষেত্রে তারা এ ধারণা মোটেই পোষণ করবে না যে , এ অর্থ- সম্পদের মালিক যেহেতু তারা , তাই তারা

স্বাধীনভাবে খরচ করার এখতিয়অর রাখে। বরং তারা তা খরচ করে মধ্যমপন্থায়। না তারা অপচয় করে আর না কৃপণতা।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে কাসির বলেন

ليسوا مبذرين في إنفاقهم، فيصرفون فوق الحاجة، ولا بخلاء على أهلهم، فيقصرون في حقهم، فلا يكفونهم بل عدلا وخيرا، وخيرا الأمور أوسطها

তারা খরচে অপচয়ী নয় , তাই প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খরচ করে না আবার তারা তাদের পরিবার পরিজনের ক্ষেত্রে খরচে কৃপণও নয় বরং তারা ভারসাম্য রক্ষাকারী। আর মধ্যমপন্থাই উত্তম পন্থা। (তাফসীরে ইবন কাসীর, খ: ৩ পৃ: ৩২৫)

অপচয় ও কৃপণতা- এর কোনটিই ইসলাম সমর্থন করে না। খরচের ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান হচ্ছে মধ্যম পন্থায় খরচ। এ ব্যাপারে কুরআন মজীদের আরেক আয়াতে বলা হয়েছে।

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ﴿29﴾

‘তুমি তোমার হাতকে তোমার গলার সাথে আটকিয়ে রেখো না (অর্থাৎ ব্যয়কুণ্ঠ হয়ো না) আবার তা একেবারে প্রশস্ত করেও দিও না (অর্থাৎ খরচের ক্ষেত্রে হাতকে প্রসারিত করেও দিও না) তাহলে তুমি তিরস্কৃত , নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে।’ (২৯ : বনী ইসরাঈল)

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿68﴾ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا.

শব্দার্থ : لَا يَدْعُونَ তারা ডাকেনা مَعَ সাথে آخَرَ অন্য ولا يقتلون তারা হত্যা করে না لَا يَزْنُونَ তারা যেনা- ব্যভিচার করে না من يفعل যে করে يَلْقَ সম্মুখীন হবে أَثَامًا শাস্তি يُضَاعَفْ দ্বিগুণ করা হবে يَخْلُدْ স্থায়ী হবে مُهَانًا লাঞ্ছিত, অপমাণিত।

‘এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহের ইবাদত করে না। আল্লাহ যার হত্যা অবৈধ করেছেন সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে একাজ করবে সে শাস্তির সম্মুখীন হবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুন করা হবে এবং তথায় সে লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে।’

আলোচনার এ অংশের সাথে পূর্বের অংশের সম্পর্ক বিষয়ে ইমাম কুরতবী রহ. বলেন

قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إخراج لعباده المؤمنين من صفات الكفرة فى عبادتهم الأوثان، وقتلهم النفس بوأد البنات وغير ذلك من الظلم والاغتيال والغارات، ومن الزنى الذي كان عندهم مباحا.

‘ যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহের ইবাদত করে না’

বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহ তার মুমিন বান্দাদেরকে কাফিরদের বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত করেছেন। আর সেগুলো হলো তাদের মূর্তি পূজা , মেয়েদের জীবন্ত পূঁতে ফেলার মাধ্যমে বা অন্য কোন উপায়ে অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা , গুপ্ত হত্যা , অন্যায়ভাবে কারো উপর আক্রমণ , যেনা-ব্যভিচার- যা তাদের কাছে বৈধ ছিল। (তাফসীরে কুরতবী , খ. ১৩ পৃ: ৭৫)

আল্লাহর খাঁটি বান্দাদের বৈশিষ্ট্যসমূহের আলোচনার শুরুতে তাদেরকে সম্মান ও মর্যাদার উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এর পর তাদের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আলোচনা করা হয়েছে এমন সব জঘন্য অপরাধের যেগুলো থেকে তারা সম্পূর্ণ মুক্ত। রাহমান-

এর বান্দারা একাধিক উত্তম বৈশিষ্ট্যসমূহের অধিকারী। আরেকদিকে তারা শির্ক, হত্যা, ব্যভিচার এ সব জঘন্য অপরাধ থেকে মুক্ত। আয়াতে উল্লেখিত এ তিনটি অপরাধকে হাদীসেও জঘন্য অপরাধ হিসেবে চি হ্নত করা হয়েছে।

عن عبد الله بن مسعود قال: قلت يا رسول الله أيّ الذنب أكبر عند الله ؟ قال : أن ةدعو لله ندا وهو خلقك. قال : ثم أي؟ قال أن ةقتل ولدك مخافة أن يطعم قال ثم أي؟ أن تزانى حليلة جارك.

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত যে আমি বললাম , হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি ? তিনি বললেন, ‘আল্লাহর সাথে শরীক করা অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।’ তিনি বললেন, তারপর কোনটি? বললেব, ‘তোমদের সন্তাকে এ আশঙ্কায় হত্যা করা যে, সে খাবে! (অভাব ও দারিদ্রের ভয়ে হত্রা করা)। তিনি বললেন, তারপর কোনটি ? বললেন, ‘তোমার প্রতিবেশির স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা। (মুসলিম)

এ তিনটি গুনাহ সবচেয়ে বড় গুনাহ। একটির সম্পর্ক আল্লাহর সাথে আর বাকী দু 'টির সম্পর্ক মানুষের সাথে। আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত গুনাহটি হচ্ছে শির্ক। শির্ককে কুরআন মজীদে 'জুলমে আজীম' বলা হয়েছে। লোকমান আ. নিজ ছেলেকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন।

يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿13﴾

'হে আমার স্নেহের ছেলে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না। কেননা শির্ক জুলমে আজীম'। (১৩ : লোকমান)

'জুলমে আজীম' অর্থ হলো বড় ধরনের অবিচার। কুরআন মজীদ আর কোন অন্যায় ও অপরাধকে 'জুলমে আজীম' হিসেবে অভিহিত করেনি। পুরো কুরআনে এ একটি অপরাধকেই 'জুলমে আজীম'- বড় ধরনের অবিচার বলা হয়েছে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটিকে বলেছেন সবচেয়ে বড় গুনাহ হওয়ার কারণ হচ্ছে শিরকের মাধ্যমে আল্লাহর অধিকার লঙ্ঘিত হয়। 'শির্ক' না করা বান্দার উপর আল্লাহর অধিকার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا.

'বান্দার উপর আল্লাহর 'হক' হচ্ছে, সে কেবল তাঁরই ইবাদত করবে, তার সাথে কাউকে শরীক করবে না, আর আল্লাহর উপর বান্দার হক হচ্ছে, যে তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করবে না তাকে শাস্তি না দেয়া।' (বুখারী ও মুসলিম)

শিরকের মাধ্যমে আল্লাহর ধিকার লঙ্ঘন হয় বলেই শির্ক জঘন্য অপরাধ। শির্ক সবচেয়ে বড় গুনাহ, শির্ক অমার্জনীয় অপরাধ।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

'আল্লাহ তাঁর সাথে শির্ক করাকে ক্ষমা করবেন না। এছাড়া অন্য অপরাধ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন।' (৪৮ ও ১১৬ : নিসা)

প্রথম আয়াতে অর্থাৎ ৪৮ নম্বর আয়াতে 'শির্ক' যে অমার্জনীয় অপরাধ তার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে,

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

‘ যে আল্লাহর সাথে শির্ক করল সে তো মস্তবড় অপরাধ করল। ’ এ জঘন্য অপরাধে আল্লাহ এতবেশি অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন যে , আল্লাহ তা ক্ষমা করেন না। ১১৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে,

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

‘ যে শির্ক করল সে তো গুমরাহী ও পথভ্রষ্টতায় অনেক দূর গড়িয়ে গেল।’ কেননা শিরকের উপর আর কোন গুমরাহী নেই। আর শির্ক এতবড় অপরাধ ও জঘন্য গুমরাহী কেনই বা হবে না? যে ‘শির্ক’ করে সে খালেক-স্রষ্টার সাথে তাঁর কোন দুর্বল সৃষ্টিকে শরিক করে। মানে সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাথে তাঁর অংশীদার বানায়। আল্লাহর জন্য সীমাবদ্ধ বিষয়কে ছিনিয়ে নিয়ে তাঁর কোন মাখলুক তথা সৃষ্টিকে দেয়। আর এ মাখলুকের সৃষ্টি , স্থিতি, ভাল-মন্দ সব আল্লাহরই এখতিয়ারে। যে মাখলুককে সে আল্লাহর মর্যাদায় আসীন করে তার তো অকল্যাণ ও ক্ষতি হতে পারে। অথচ আল্লাহ এর উর্ধ্বে। এমিাখলুক নিঃশেষ ও বিলনি

হয়ে যাবে , অথচ আল্লাহ চিরঞ্জীব , তাঁর মৃত্যু নেই। তিনি কখনো নিঃশেষ হয়ে যাবেন না। তিনি ছিলেন, আছেন ও থাকবেন।

أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿191﴾ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿192﴾

'তোমরা কি (আল্লাহর সাথে) তাদেরকে শরিক বানাচ্ছ যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। তদুপরি তারা নিজেরাই (আল্লাহর) সৃষ্ট আর তারা নিজেদের সাহায্যও করতে পারে না।' **(১৯১-১৯২ : আ'রাফ)**

শির্ক যে অমার্জনীয় অপরাধ শুধু তাই নয় বরং শির্ক এতটা ভয়াবহ যে , শির্ক যাবতীয় আমল নষ্ট করে দেয়। তাই কারো মধ্যে শির্ক থাকলে তার কোন আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। সে আমল যত বড় ধরণের ও যত গুরুত্বপূর্ণ আমলই হোক না কেন। আল্লাহ তাঁর প্রিয়তম ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়অসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন :

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿65﴾

‘তোমার কাছে এবং তোমার পূর্ববর্তীদের কাছে এ বিষয়ে আমি ওহী পাঠিয়েছি যে, তুমি যদি শির্ক কর তাহলে তোমার যাবতীয় আমল বরবাদ হয়ে যাবে , আর তখন তুমি হবে নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্তদের একজন।’ (৬৫ : যুমার)

এ আয়াত থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হল যে , সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকেই শির্ক হচ্ছে এমন একটি মারাত্মক ব্যধি যা মানুষের নেক আমলকে নষ্ট করে দেয়। আল্লাহ আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বের সকল নবী রাসূলকে ওহীর মাধ্যমে এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন। সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে যে, শির্ক তাঁর আমলকে নষ্ট করে দেবে। আর তাঁর আমল হচ্ছে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। তা হল রেসালাতের দায়িত্ব পালন। ‘আমল নষ্ট হয়ে যাবে ’ শুধু এতটুকু বলেই শেষ করা হয়নি। বরং আরো বলা হয়েছে , ‘তুমি হবে নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্তদের একজন। ’ এ কথার অর্থ খুবই স্পষ্ট। শির্ক যদি সব নেক আমলকে নষ্ট করে দেয় , তাহলে আর কিছুই বাকি থাকল না। আর এ অবস্থায় ক্ষতি তো

অনিবার্য। এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে এ বিষয়টি তাঁর উম্মাতের জন্যও প্রযোজ্য।

শির্ক জান্নাতকে মুমিনের জন্য হারাম করে দেয়। অপরদিকে তাওহীদ মুমিনের জন্য জাহান্নামকে হারাম করে দেয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.

'আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের জন্য যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' (আল্লাহ ছাড়া আর কোনো হক্ক ইলাহ নেই) বলে , আল্লাহ তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেন। (মানে জাহান্নাম থেকে তার মুক্তি সুনিশ্চিত করে দেন।)' (বুখারী ও মুসলিম)

وجاء في حديث معاذ بن جبل وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا.

মু'আজ ইবন জাবাল থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে , 'আল্লাহর উপর বান্দাহর হক হল , যে তার সাথে 'শির্ক' করবে না, তাকে শাস্তি না দেয়া!' (বুখারী ও মুসলিম)

শির্ক এর পরিণাম ও পরিণতি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। শির্ক জান্নাতকে হারাম করে দেয়। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন :

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿72﴾

'যে আল্লাহর সাথে 'শির্ক' করবে, আল্লাহ তার উপর জান্নাতকে হারাম করে দেবেন। আর তার আবাস হবে জাহান্নাম। জালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই।' (৭২ : মায়েদা)

এতো হলো আখিরাতে শিরকের পরিণাম , দুনিয়াতে শিরকের পরিণাম হলো শির্ক বান্দাহকে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়। আকীদা বিশ্বাস, মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনায় তার পতন ঘটে। সে বিশ্বাসের সীমাহীন দিগন্তে ডিগবাজি খায়। নিজের আতমমর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে যা তার আজ্ঞাবহ হয়। যাকে তাকে পূজনীয় বরণীয় মনে করে। ফলে তার শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব ও সুদৃঢ় মানসিকতা গড়ে ওঠে না। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿31﴾

‘যে আল্লাহর সাথে শির্ক করে সে যেন আকাশ থেকে ছিকটে পড়ে আর (মৃতভোজী) পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায় অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোন দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করে দেয়।’ (৩১ : হজ্ব)

এ আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে হতে পারে , যে শির্ক করে সে আকীদা-বিশ্বাস চিন্তা-দর্শনে এতটা দুর্বল ও অসহায় যে , যে কেউ তাকে আজ্ঞাবহ ও অনুগত বানিয়ে তার সম্মান , ভক্তি-শ্রদ্ধা, পূজা-অর্চনা সহজেই আদায় করে নিতে পারে। আর এর বাস্তব চিত্র আমরা আমাদের চারপাশে নিয়মিত প্রত্যক্ষ করছি।

আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের বৈশিষ্ট্যসমূহের আলোচনার এ অংশে শির্ক ছাড়া আরও দু’টি বড় ধরনের অপরাধের কথা বলা হয়েছে , একটি হচ্ছে হত্যা, আরেকটি যেনা-ব্যভিচার। প্রথমটির সম্পর্ক জীবনের সাথে অপরটির সম্পর্ক সম্মান ও সম্ভ্রমের সাথে। আর এ দু ’টিই মানুষের কাছে খুব মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ। যে কোন মানুষের জীবন ও সম্ভ্রম তার

কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি মানুষেরই বাঁচার ও সম্ভ্রম রক্ষার অধিকার রয়েছে। তাই ইসলাম মানুষের জীবন ও সম্মানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।

অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে,

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

'আল্লাহ যার হত্যা অবৈধ করেছেন যথাযথ কারণ ব্যতীত তোমরা তাকে হত্যা করো না।' (১৫১ : আনআম ও ৩৩ : বনী ইসরাঈল)

ইসলাম একটি হত্যাকে গোটা মানবতার হত্যা বলে বিবেচনা করে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا .

'যে কাউকে কোনো প্রাণের বিনিময় অথবা পৃথিবীতে অরাজতা সৃষ্টির (অপরাধ) ছাড়া হত্যা করল সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করল , আর

যে কারও জীবন রক্ষা করল সে যেন সকল মানুষের জীবন রক্ষা করল।' (৩২ : মায়েদা)

মানুষের জীবনের মর্যাদা ও তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ইসলামের অবস্থান বুঝার জন্য এ একটি আয়াতই যথেষ্ট। একটি হত্যাকে গোটা মানবতাকে হত্যা বলে অভিহিত করা হয়েছে একজন মানুষের জীবন রক্ষাকে গোটা মানব জাতির জীবন রক্ষা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

কেউ অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করলে ইসলাম হত্যাকারীকে হত্যার শাস্তির বিধান দিয়েছে। ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় একে বলা হয় 'কিসাস' আর এ কিসাসকে ইসলাম বলেছে জীবন। আল্লাহ তা 'আলা এরশাদ করেছেন,

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿179﴾

'আর তোমাদের জন্য কিসাসে রয়েছে জীবন , হে বুদ্ধিসম্পন্ন লোকগণ! যেন তোমরা সাবধান হতে পার।' (১৭৯ : বাকারা)

অন্যায়ভাবে যে কাউকে হত্যা করবে , তাকে এ হত্যার শাস্তি হিসেবে হত্যা করা হবে- এটিকে কুরআনের পরিভাষায় 'কিসাস' বলা হয়েছে। জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে , কিসাসের মধ্যেই জীবন। হত্যাকারীকে হত্যা করা হলে সে আর কাউকে হত্যার সুযোগ পাবে না। আর যারা এ শাস্তি দেখবে ও শুনবে তারা কাউকে হত্যা করার সাহস করবে না। এভাবেই রক্ষা পাবে অনেক জীবন তাই কুরআন হত্যাকারীর হত্যা (কিসাস) কে জীবন বলেছে।

ইসলাম হত্যাকে একটি মানবতা বিরোধী অপরাধ হিসেবে চি হ্নত করে এবং অপরাধের কঠিন শাস্তির বিধান করে মানুষের জীবনের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মানুষের জীবনের নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করেছে।

হত্যার সাথে আরেকটি অপরাধের উল্লেখ করা হয়েছে , সেটি হলো যেন- ব্যাভিচার। এটিকেও ইসলাম জঘন্য অপরাধ হিসেবে চি হ্নত করেছে। ইসলাম আল্লাহর কাছ থেকে আসা একমাত্র পরিপূর্ণ দ্বীন। মানুষের স্রষ্টা হিসেবে মানুষের প্রকৃতি ও স্বভাব সম্পর্কে আল্লাহই সবচেয়ে বেশি জানেন। তাই তাঁর কাছ থেকে আসা ইসলাম একটি স্বভাবসম্মত দ্বীন। এতে স্বভাব ও প্রকৃতি বিরোধী কোন বিধান নেই। মানুষের যৌন চাহিদা একটি স্বভাবসম্মত চাহিদা। এ চাহিদা পূরণের

বৈধ উপায় হচ্ছে নারী- পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক। ইসলাম বিবাহকে শুধু বৈধই করেনি বরং বিবাহের জন্য উৎসাহিত করেছে। নারী- পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ককে আল্লাহ তাঁর নিদর্শন হিসেবে চি হ্নত করেছেন :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿21﴾

'আর তার নিদর্শনসমূহের মধ্যে (একটি নিদর্শন) হলো তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য রয়েছে নিদর্শনাবলী।' (২১ : রূম)

বৈধভাবে বিবাহের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক আল্লাহর একটি নিদর্শন। পুরুষ ও নারীর যৌন চাহিদা পূরনের এটিই বৈধ মাধ্যম। এর বাইরের কোন মাধ্যমকে ইসলাম বৈধতা দেয় না। এর বাইরের সকল উপায়কে ইসলাম অশ্লীলতা হিসেবে চি হ্নত করেছে। বিবাহ বহির্ভূত যৌনতাকে ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। আল্লাহ এটিকে এত অপছন্দ

করেন যে , তিনি এ জঘন্য কাজটির ধারে কাছে যেতেও নিষেধ করেছেন এবঙ বলেছেন যে এটি অশ্লীল ও নিকৃষ্ট কাজ।

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿32﴾

‘আর তোমরা যেনা (ব্যাভিচারের) কাছে যেও না। নিশ্চয় এটি অশ্লীল কাজ ও মন্দপথ।’(৩২:বনী ইসরাঈল)

এ কাজটি যতটা ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় তার শাস্তিও ততটা কঠিন। যদি অবিবাহিত বা অবিবাহিতা হয় তাহলে একশত চাবুকের আঘাত আর যদি বিবাহিত বা বিবাহিতা হয় তাহলে রজম- মানের পাথর নিক্ষেপ করে মৃত্যু কার্যকর করা। আর এ শাস্তি কার্যকর করা হবে জনসম্মুখে , গোপনে নয়। এ শাস্তি কার্যকর করার সময় তাদের প্রতি কোন সহানুভূতি ও সহমির্মত দেখানো যাবে না। আল্লাহ তা ‘আলা এরশাদ করেন,

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿2﴾

‘ব্যভিচারিনী নারী আর ব্যভিচারী পুরুষ তাদের প্রত্যেককে একশত চাবুকের আঘাত কর আর আল্লাহর দ্বীন (বিধান) কার্যকর করণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মধ্যে কোন অনুকম্পার উদ্রেক না হয় , যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর মুসলমানদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।’(২: নূর)

এ আয়াতে দু ’টি বিষয় প্রনিধানযোগ্য একটি হলো ব্যভিচারে অভিযুক্তদের শাস্তি যখন কার্যকর করা হবে তখন যারা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী হবে তাদের মনে অপরাধীর প্রতি কোন ধরনের অনুকম্পা ও সহানুভূতি আসবে না। আরেকটি হলো ব্যভিচারের শাস্তি গোপনে কার্যকরা করা যাবে না বরং জনসম্মুখে এ শাস্তি কার্যকর করতে হবে। কারণ এ শাস্তির উদ্দেশ্য শুধু অপরাধীদের শাস্তি দেয়া নয় বরং এর মূল উদ্দেশ্য মুমিন সমাজকে পবিত্র ও কলুষতা মুক্ত করা। যারা এ অপমানজনক ও কঠিন শাস্তি দেখবে তারা সতর্ক হয়ে যাবে। কখনো তাদের মনে এ অপরাধের চিন্তা আসলে সাথে সাথে শাস্তির ভয়াবহ দৃশ্যও তার মানসপটে ভেসে আসবে আর তাকে অপরাধ থেকে বিরত রাখবে। এভাবে মুমিন সমাজ অশ্লীলতা মুক্ত একটি পবিত্র সমাজে পরিণত হবে।

শির্ক, হত্যা ও যেন- ব্যভিচার এ তিনটি বড় বড় গুনাহের পরই বলা হয়েছে,

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿68﴾ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴿69﴾

'যে এ কাজ করে সে শাস্তির সম্মুখীন হবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং তথায় সে লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে।'

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে , যে এ কাজ করবে সে শাস্তির সম্মুখীন হবে। সম্ভবত এখানে যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে তা দুনিয়ার শাস্তি। কেননা পরবর্তী আয়াতে আখিরাতের শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। শির্ক, হত্যা ও ব্যভিচারের শাস্তি যে আখিরাতে হবে শুধু তাই নয়। দুনিয়াতেও এ সব জঘন্য অপরাধের শাস্তি হবে। শির্ক যে করে সে মুশরিক। ইসলামী রাষ্ট্র মুশরিকদের সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করবে। তার এ দাওয়াত গ্রহণ না করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তার থাকবে। যদি সে এ দাওয়াত গ্রহণ না করে তাহলে তাকে অবশ্যই ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে 'জিযিয়া' প্রদান করতে হবে। তার আদর্শ

ও চেতনা বিরোধী একটি আদর্শিক রাষ্ট্রের অধীন হয়ে থাকা এবং ‘জিযিয়া’ প্রদান করা এটা তার জন্য অবশ্যই একটি শাস্তি।

অন্য দিকে কেউ যদি ইসলাম গ্রহণের পর প্রকাশ্যে শির্ক করে তাহলে ইসলামী রাষ্ট্র মুরতাদ হিসেবে চি হ্নত করে তাকে শাস্তি দেবে। আর এ শাস্তি হলো মৃত্যুদন্ড।

হত্যার শাস্তি হলো হত্যাকারীকে হত্যা করা

যে শাস্তি হলো চাবুকের আঘাত অথবা পাথর নিক্ষেপ করে মারা। ইতোপূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র অবশ্যই এ শাস্তিগুলো কার্যকর করবে। এতো হলো এসব অপরাধের পার্থিক শাস্তি। আখিরাতের শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে , ‘কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে।’

দুনিয়া ও আখিরাতের কঠিন শাস্তির পরই বলা হয়েছে তাওবা, ঈমান ও নেক আমলের কথা। আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ করেন,

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿70﴾ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿71﴾

শব্দার্থ : مَنْ تَابَ যে তাওবা করেছে آمَنَ ঈমান এনেছে عَمِلَ আমল করেছে عمَل আমল, কাজ صَالِحًا নেক, সৎ يُبَدِّلُ পরিবর্তন করবে سَيِّئَاتِ অপরাধসমূহ (এক বচন سيئة অপরাধ, অন্যায়) حَسَنَاتٍ পূণ্যসমূহ (এক বচন حسنة পূণ্য, কল্যাণ) يَتُوبُ সে প্রত্যাবর্তন করে।

‘তবে যারা তাওবা করে , ঈমান আনে এবং নেক আমল করে আল্লাহ তাদের অপরাধগুলোকে পূণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালূ। যে তাওবা করে ও নেক আমল করে সে সত্যিকার অর্থে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে।’

রহমান- এর বান্দাদের বৈশিষ্ট্য বিষয়ের আলোচনায় বলা হয়েছে যে , তারা যে শুধু ভাল কাজ করে তাই নয় , তারা আল্লাহর নাফরমানী থেকেও বিরত থাকে। এ পর্যায়ে তিনটি বড় বড় নাফরমানীর উল্লেখ করা হয়েছে। শির্ক , হত্যা ও যেনা- ব্যভিচার নাফরমানীগুলোর পরই বলা হয়েছে যারা এসব নাফরমানী ও অপরাধ করবে তাদের জন্য রয়েছে দ্বিগুণ শাস্তি। শাস্তির পরিমাণ যে ভয়াবহ হবে শুধু তাই নয়। এ

শাস্তি হবে অপমানজনক ও লাঞ্ছনাকর। এ শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে তারাই যারা তাওবা করবে , ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে। কিয়ামতের কঠিন ও লাঞ্ছনাকর শাস্তি থেকে বাঁচতে হলে তিনটি জিনিস প্রয়োজন তাওবা, খাঁটি ঈমান ও নেক আমল। এর কোন একটি নয় , দুটিও নয়। তিনটিই প্রয়োজন। শুধু তাওবা নয়, তাওবার সাথে থাকতে হবে কাঁটি ঈমান আর তার সাথে থাকতে হবে আমলে সালেহ- নেক আমল। আর যাদের মধ্যে এ তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকবে তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে,

﴿فَأُوْلَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمۡ حَسَنَٰتٖۗ﴾ [الفرقان: ٦٩]

'আর তারাই (এমন লোক) যাদের অপরাধগুলোকে আল্লাহ পূণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন।'

এই যে পাপ ও অপরাধকে পূণ্য দ্বারা পরিবর্তন করা হবে এ বিষয়ে ইমাম ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন-

في معنى قوله (يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ) قولان أحدهما أنهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات. قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى الآية قال : هم

المؤمنون كانوا من قبل إيمانهم على السيئات، فرغب الله بهم عن السيئاة فحولهم إلى الحسناة فأبدلهم مكان السيئاة الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات وما ذاك إلا لأنه كلما تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفر فينقلب الذنب طاعة.

তাদের অপরাধগুলোকে আল্লাহ পূণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন এর অর্থে দু ধরনের বক্তব্য রয়েছে। একটি হলো তারা নেক কাজের মাধ্যমে অন্যায় কাজের পরিবর্তন করেছে (মানে আগে তারা যেখানে অন্রায় কাজ করত এখন সেখানে তারা ভাল কাজ করছে)। আয়াতের অর্থে আলী ইবন আবি তালহা আব্দুল্লাহ ইবন আববাস থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন, এরা ঐসব মুমিন যারা তাদের ঈমানের আগে অন্রায় ও অপরাধমূলক কাজ করত। আল্লাহ তাদেরকে অন্যায় ও অপরাধ থেকে ফিরিয়ে নেক ও কল্যাণের দিকে এনে দিয়েছেন। এভাবে তিনি তাদেরকে মন্দ ও অন্যায় থেকে নেক ও কল্যাণে পরিবর্তন করে দিয়েছেন।

আর দ্বিতীয়টি হলো, খাঁটি তাওবার কারণে তাদের অতীত অপরাধগুলো নেক ও কল্যাণে পরিবর্তিত হচ্ছে আর তা এভাবে যে , যখনি সে তার অতীতকে স্মরণ করে সে অনুতপ্ত হয় , আল্লাহর দিকে ফিরে আসে ও ক্ষমা চায়, আর এভাবে তার গুনাহ পূণ্যে পরিবর্তিত হয়।

ঈমাম ইবনে কাসীর আয়াতের ব্যাখ্যায় এ দু’টো বক্তব্য পেশ করার পর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি আবু জার (রাঃ)- এর সূত্রে ঈমাম মুসলিম (রা.) বর্ণনা করেছেন,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنى لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا إلى الجنة، يؤتى برجل فيقول نحّوا عنه كبار ذنوبه وسلوه عن صغارها، قال فيقال له : عملت يوم كذا كذا وكذا وعملت يوم كذا كذا وكذا فيقول : نعم لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئا فيقال : فإن لك بكل سيئة حسنة فيقول : يارب عملت أشياء لا أراها ههنا. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى بدت نواجذه. (مسلم)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন , ‘জাহান্নাম থেকে সর্বশেষ বের হওয়া ও বেহেশতে সর্বশেষ প্রবেশ করা ব্যক্তিকে আমি সবচেয়ে ভাল জানি। একজন লোককে হাজির করা হবে। আল্লাহ (ফেরেশতাদের) বলবেন, তার থেকে তার বড় বড় গুনাহগুলো দূরে সরিয়ে রেখে তাকে ছোট ছোট গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। অতঃপর তাকে বলা হবে, তুমি অমুক দিন এিএিই কাজ করেছ এবং অমুক দিন এই এই কাজ করেছ। সে বলবে , হ্যাঁ। আসলে সে কোন কিছুই

অস্বীকার করতে পারবে না। তারপর তাকে বলা হবে , তোমার প্রতিটি অপরাধের বিনিময়ে তোমার জন্য রয়েছে পূণ্য ও কল্যাণ। তখন সে বলে উঠবে, হে আমার রব- প্রভু! আমি তো এমন অনেক (মন্দ) কাজ করেছি যেগুলো এখানে দেখতে পাচ্ছি না। ' বর্ণনাকারী সাহাবী আবু জার রা. বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একথা বলে) এমনভাবে হাসলেন যে , তার ভেতরের দাঁত পর্যন্ত দেখা গেল। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, খ : ৩ পৃ: ৩২৭)

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে :

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿70﴾

'আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালূ'। কুরআন মজীদে (غَفُورًا) 'ক্ষমাশীল' শব্দটি মোট একানববই বার এসেছে। অধিকাংশ স্থানে শব্দটির পর (رَحِيمًا) 'দয়ালু' শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্ষমা ও দয়া শব্দ দুটির মধ্যে রয়েছে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। ক্ষমা সেই করতে পারে যার মধ্যে দয়া আছে। যার মধ্যে দয়া নেই , সে ক্ষমা

করতে পারে না। কুরআন মজীদে বার বার বলা হয়েছে 'আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু, বান্দাহকে আল্লাহ ক্ষমা করেন, কারণ তিনি যে পরম দয়ালু।

পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, ' যে তাওবা করে ও নেক আমল করে সে সত্যিকার অর্থে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে।'

যে ব্যক্তি কোন অপরাধ করে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে তাওবা করে, শুধু তাওবা নয় নেক আমলও করে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে ক্ষমা করে দেন। তাওবা ও নেক আমল দু 'টিকে একত্রে উল্লেখ করে সম্ভবত এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বান্দার জন্য যা শোভনীয় নয়, যা অন্যায়, অপরাধ ও পাপ তা সে ছেড়ে দেবে , তার জন্য সে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে। আর যা তার করা উচিত যা তার জন্য কল্যাণকর, যার পরিণাম ও পরিণতি শুভ সে তা করবে। গুনাহ ও অপরাধ করলেই যে তাওবা করতে হয় তা নয় বরং সব সময়ই আল্লাহর কাছে তাওবা করতে হয়। তাওবা নিজেই একটি ইবাদত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগে পরের সব গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছিলেন তারপরও তিনি তাওবা করতেন।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة. (رواه البخاري)

আবু হোরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি , 'আল্লাহর কসম! আমি দিনে সত্তর বারের অধিক আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই ও তার কাছে তাওবা করি।'(বুখারি)

বান্দাহ গুনাহ করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে- এটি আল্লাহ খুব পছন্দ করেন। আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفرلهم. (رواه مسلم)

' সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা যদি গুনাহ না করতে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সরিয়ে নিতেন। অতঃপর অন্য এক জাতিকে নিয়ে আসতেন যারা গুনাহ করত অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত, আর তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন।' (মুসলিম)

আল্লাহ ক্ষমাসীল। বান্দাহ যদি গুনাহই না করল তাহলে তার এগুণ ও বৈশিষ্ট্যের কার্যকারিতা থাকত না। তাই তো তিনি চান বান্দাহ ও গুনাহ করবে আর তার কাছে ক্ষমাও চাইবে। তিনি বান্দাহকে ক্ষমা করবেন। এভাবেই তাঁর ক্ষমাশীলতার প্রকাশ ঘটবে। বান্দাহর অপরাধ ও গুনাহর পরিমাণ যত বেশিই হোক না কেন তাওবা করলে তিনি বান্দাহকে ক্ষমা করবেন বলে আশ্বস্থ করেছেন,

عن أنس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قال الله تعالى : يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. (رواه الترمذي)

আনাস রা. থেকে বর্ণিত। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, 'আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আদম সন্তান ! তোমার পাপের পরিমাণ যদি আকাশচুম্বীও হয় আর তুমি যদি আমার কাছে ক্ষমা চাও , আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব। এ ব্যাপারে আমি পরোয়াই করব না।' (তিরমিযী)

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল তাওবা ও ইসতেগফার করলে আল্লাহ খুশি হন। তাই আল্লাহ নেক বান্দাগণের উল্লেখযোগ্য

বৈশিষ্ট্য হলো যে তারা তাওবা ও ইস্তেগফার করেন। আল্লাহ তাঁর সফলতা প্রাপ্ত বান্দাহদের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন এভাবে,

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿112﴾

'তারা তাওবাকারী, ইবাদতকারী, (আল্লাহর) প্রশংসাকারী, (আল্লাহর উদ্দেশ্যে) ভ্রমণকারী , রুকুকারী, সিজদাকারী, সৎকাজের আদেশ দানকারী, মন্দ কাজ থেকে নিবৃতকারী , এবং আল্লাহর সীমাসমূহের হিফাজতকারী। সুসংবাদ দাও মুমিনদেরকে।' (১১২ : তাওবা)

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴿17﴾

'তারা ধৈর্য্যধারণকারী, সত্যবাদী, বিনয়ের সাথে নির্দেশ সম্পাদনকারী, খরচকারী এবং শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।' (১৭: আলে ইমরান)

আল্লাহর নেক বান্দাগণ বড় ধরনের কোন অপরাধ করে না। করলেও তারা সাথে সাথে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়।

তারা অপরাধ করলেই যে ক্ষমা চায় , শুধু তাই নয় , ক্ষমা চাওয়াই তাদের বৈশিষ্ট্য।

তাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো , তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং অর্থহীন কাজ কর্মকে ভদ্রভাবে এড়িয়ে যায়। আল্লাহপাক এরশাদ করেছেন:

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا.

শব্দার্থ: لَا يَشْهَدُونَ তারা সাক্ষ্য দেয় না الزُّورَ মিথ্যা , অন্যায় مَرُّوا অতিক্রম করে اللَّغْوِ অর্থহীন كِرَامًا সম্মান-মর্যাদা।

'এবং যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং যখন অর্থহীন ও অনর্থক কাজ কর্মের সম্মুখীন হয় তখন সম্মান- মর্যাদা রক্ষা করে ভদ্রভাবে চলে যায়।'

আয়াতে উল্লিখিত (لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ) এর দুটি অর্থ। একটি হলো 'তারা সাক্ষ্য দেয় না ' আরেকটি হলো 'তারা উপস্থিত থাকে না। ' (الزُّورَ)শব্দটিরও একাধিক অর্থ রয়েছে। মিথ্যা , অন্যায়, মিথ্যা সাক্ষী,

শির্ক, নাচ-গানের অনুষ্ঠান ইত্যাদি। তাহলে (لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ) এর একাধিক অর্থ হতে পারে। আল্লাহর নেক বান্দাগণ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না, কারণ এতে অন্যের ন্যায়সঙ্গত অধিকার খর্ব হয়। অপরদিকে অন্যায়কে সাহায্য করা হয়। অন্যায় ও মিথ্যার চর্চা হয় এমন কোন স্থানে তারা কখনো উপস্থিত হয় না। শির্ক হয় এমন কোন অনুষ্ঠানে তারা উপস্থিত থাকে না। তারা গান- বাজনা ও নাচের অনুষ্ঠানে যায় না।

আব্দুল্লাহ ইবন আববাস (الزُّورَ) এর অর্থ করেছেন -

إنه أعياد المشركين

অর্থাৎ- (الزُّورَ) 'যূর' হচ্ছে মুশরিকদের ধর্মীয় উৎসবাদি। (কুরতবী খঃ ১৩ পৃঃ৭৯) তাঁর এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবে আল্লাহর নেক বান্দাগণ অমুসলিমদের ধর্মীয়- অনুষ্ঠানাদিতে যায়না। তারা যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়না, অনৈতিক কোন কাজ করে না ও অশোভনীয় কোন আচার অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয় না শুধু তাই নয়, যদি কখনো এসবের কাছ দিয়ে যেতে হয় তাহলে তারা খুবই সতর্কতার সাথে এসব এড়িয়ে চলে।

وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا.

‘যখন তারা অর্থহীন কোন কাজের পাশ দিয়ে যায় তখন সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করে তা অতিক্রম করে।’

(لغو) শব্দটির অর্থ অর্থহীন কথা বা কাজ। এমন কথা ও কাজ যার কোন ধরনের গুরুত্ব নেই। মুমিন কোন ধরনের অর্থহীন কথা বলতে পারে না, অর্থহীন কাজ করতে পারে না। এটি সফল মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন-

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿1﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿2﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿3﴾

‘মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে। যারা নিজেদের নামাযে বিনয়ী আর যারা অর্থহীন কথা ও কাজ থেকে বিরত।’ (১-৩ : মুমিনুন)

মুমিন নিজকে কখনো অনর্থক ও গুরুত্বহীন কোন বিষয়ে জড়ায়না। মুমিন তো তার সময়ের শ্রেষ্ঠ ব্যবহার করবে। সময় নামক মূল্যবান পূঁজির সর্বোত্তম বিনিয়োগ করবে। এমন কথা ও কাজে সময় খরচ করবে যা তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে দুনিয়া ও আখিরাতে। সে অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সাথে তার সময়কে কাজে লাগাবে।

রহমান- এর বান্দাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো :

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا.

শব্দার্থ : ذكروا তাদের স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে آيات আয়াতসমূহ, নিদর্শনাবলী (এক বচন آية-আয়াত, নিদর্শন) لم يخروا তারা ঝুঁকে পড়ে না صما বধির عميان অন্ধ।

'এবং যাদেরকে তাদের রব (পালন কর্তার) আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হলে বধির ও অন্ধের মত তাতে ঝুঁকে পড়ে না।'

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীর 'ফাতহুলকাদীরে' বলা হয়েছে,

لم يقعوا عليها حال كونهم صما وعميانا، ولكنهم أكبوا عليها سامعين مبصرين وانتفعوا بها، لم يتغافلوا عنها.

আল্লাহর আয়াতসমূহের উপর তাদের অবস্থান বধির ও অন্ধের মত নয় এবং তারা তাতে ঝুঁকে পড়ে এবং অবস্থায় যে তারা শোনে, দেখে এবং তা থেকে উপকৃত হয়। আয়াতসমূহের ব্যাপারে তারা মোটেই গাফেল নয়। (খ: ৪ পৃ: ৮৮)

মুমিনদের অবস্থা এমন হতে পারে না যে , তাদেরকে আল্লাহর আয়াত স্মরণ করানো হবে। আর তাদের মধ্যে তা কোন প্রভাব ফেলবে না। মুমিন যখন আল্লাহর মহান কিতাব- কুরআন পড়বে তখন সে তা গভীর মনোযোগ সহকারে পড়বে। কুরআন বুঝবে , বুঝার চেস্টা করবে , কুরআনের আয়াতসমূহ নিয়ে গবেষণা করবে। কুরআন পড়বে অথচ কুরআন বুঝার চেষ্টা করবে না , কুরআন নিয়ে গবেষণা করবে না , এতো মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়। এটি তো এমন লোকদের বৈশিষ্ট্য যাদেরকে আল্লাহ অভিসম্পাত করেন।

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ﴿ 23 ﴾ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿24﴾

‘এদের প্রতিই আল্লাহ অভিসম্পাত করেন , অতঃপর তাদের বধির ও দৃষ্টি শক্তিহীন করেছেন। তারা কি কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা করে না। না তাদের অন্তরসমূহ তালাবদ্ধ? (২৩-২৪ মুহাম্মদ)

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল যে , কুরআন নিয়ে গবেষণা না করা আল্লাহর অভিসম্পাতপ্রাপ্ত অন্ধ-বধিরদের বৈশিষ্ট্য।

আল্লাহর মহান কিতাব- কুরআনের আয়াত একদিকে আল্লাহর নেক বান্দাহদের ঈমান বাড়িয়ে দেয়। অপরদিকে যাদের অন্তরে রয়েছে অবিশ্বাস ও কপটতা তাদের মনের অপবিত্রতা বৃদ্ধি করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿2﴾

'তারাই তো মুমিন যাদেরকে আল্লাহর স্মরণ কয়য়ে দেয়া হলে তাদের অন্তর ভীত হয়ে পড়ে। আর যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াত পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমানকে বৃদ্ধি করে । আর তারা তাদের প্রভুর উপর ভরসা করে।' (২ : আনফাল)

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى ﴿125﴾

'যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে এটি তাদের (অন্তরের) কলুষতার সাথে আরো কলুষতা বৃদ্ধি করছে।' (১২৫ : তাওবা)

সূরা ফুরকানের শেষাংশে উল্লিখিত রাহমান- করুণাময় আল্লাহর বান্দাদের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে , তারা তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য দোয়া করে।

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.

শব্দার্থ : يَقُولُونَ তারা বলে هَبْ দান কর لَنَا আমাদের জন্য أَزْوَاجِ স্বামী বা স্ত্রীগণ (এক বচন زوج স্বামী বা স্ত্রী) ذُرِّيَّات সন্তানবৃন্দ (একবচন ذرية সন্তান) قُرَّةَ শীতলতা أَعْيُنٍ চোখ সমূহ (এক বচন عين - চোখ) اجْعَلْنَا আমাদেরকে বানিয়ে দাও।

‘এবং যারা বলছে হে আমাদের প্রভু! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে আমাদের চোখের শীতলতাস্বরূপ বানিয়ে দাও এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের ঈমাম বানিয়ে দাও।’

আল্লাহর বান্দগণ নিজেরাই শুধু উত্তম বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর অধিকারী হবে তা নয়, তারা চায় তাদের

সন্তানরাও যেন এ ধরনের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী অর্জন করে। তারা চায় তাদের স্ত্রীগণ যেন তাদের মত উত্তম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয় তাহলে

মন আনন্দে ভরে যাবে। আর এ আনন্দে যে মানসিক প্রশান্তি ও তৃপ্তি পাওয়া যাবে না। আনন্দে চোখ জুড়িয়ে যাবে।

আল্লাহর নেক বান্দাগণের আকাঙ্খা তাদের সন্তান ও স্ত্রীগণ যেন আল্লাহকে যারা ভয় করে চলে তাদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ হয়। তারা তাদের আকাঙ্খা পূরণের জন্য আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানায়। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে আল্লাহ যেন তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের এমন বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর অধিকারী বানিয়ে দেয় যাতে তাদের চোখ জুড়িয়ে যায়। আল্লাহ যেন তাদেরকে মুত্তাকীদের ঈমাম (নেতা) বানিয়ে দেয়।

স্ত্রী- সন্তানদের উত্তম গুণাবলীর অধিকারী করে চোখের শীতলতারূপে বানানো ও তাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ বানানোর জন্য দোয়া করাকেও আল্লাহ তাঁর নেক বান্দাদের একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কারণ স্ত্রী- সন্তানরা হচ্ছে একজন লোকের সবচেয়ে কাছের মানুষ। এদের সম্পর্ক সবচেয়ে বেশী জবাবদিহী করতে হবে। স্ত্রী ও সন্তান যদি আল্লাহর অনুগত হয়ে চলে তাহলে একজন মুমিনের জন্য এর চেয়ে বড় প্রশান্তি আর কিছু নেই। আর যদি তারা আল্লাহর অবাধ্য হয় তাহলে এর চেয়ে বড় বেদনার কিছু নেই।

আয়াতে চোখের শীতলতা বলতে রূপ, সৌন্দর্য, পার্থিব মেধা, যোগ্যতা ও সফলতাকে বুঝানো হয়নি। বরং এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে আল্লাহর আনুগত্য ও বাধ্যতা। আল্লামা ইবনে কাসীর এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

يعنى الذين يسألون الله أن يخرج من أصلابهم من ذرياتهم من يطيعه ويعبده وحده لا شريك له.

অর্থাৎ যারা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে যে , তিনি যেন তাদের ঔরশ থেকে এমন সন্তান সৃষ্টি করেন , যে তাঁর আনুগত্য করবে ও শুধু-মাত্র তারই ইবাদত করবে। তার কোন শরীক নেই। (তাফসীর ইবনে কাসীর খঃ ৩ পৃঃ ৩২৯)

এ আয়াত সম্পর্কে হাসান বসরীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন,

لا والله لا شئ أقر لعين المسلم من أن يرى ولدا أو ولد ولد أو أخا أو حميما مطيعا لله عز و جل.

আল্লাহর শপথ, সন্তান, সন্তানের সন্তান, ভাই অথবা বন্ধুকে আল্লাহর অনুগত দেখবে মুসলমানের চোখকে ঠান্ডা ও শীতল করার জন্য এর

চেয়ে উত্তম কোন বিষয় নেই। (তাফসীরে ইবনে কাসীর , খ. ৩ পৃ: ৩২৯)

কুরআন ও হাদীসে সন্তানকে আমল-মানে 'কর্ম' হিসেবে চিহ্নত করা হয়েছে। আল্লাহ তা 'আলা নূহ (আঃ) কে তার এক সন্তান সম্পর্কে বলেন,

يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ

'হে নূহ! নিশ্চয় সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। নিশ্চয়ই সে অসৎ কর্ম। ' (৪৬ : হূদ)

অপরদিকে হাদীসে নেক সন্তান সম্পর্কে বলা হয়েছে,

إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده، أو صدقة جارية.

''আদম সন্তান (মানুষ) যখন মারা যায় তখন তার সকল আমল (কর্ম বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি কর্ম অব্যাহত থাকে। আর সেগুলো হল

নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে, এমন জ্ঞান- যা দিয়ে তার পরের লোকজন উপকৃত হয়, আর সদকায়ে জারিয়া।’ (মুসলিম)

উপরের আলোচনা থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হলো যে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে হলে শুধু নিজে ভাল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হলেই চলবে না, স্ত্রী ও সন্তানদেরকে ভালগুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বানানোর জন্য চেষ্টা করতে হবে।

রাহমান- করুণাময়ের বান্দাহদের বৈশিষ্ট্য আলোচনার পর তাদের পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে এভাবে-

أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴿75﴾ خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

শব্দার্থ : أُولَئِكَ তারা يُجْزَوْنَ তাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে الْغُرْفَةَ কক্ষ। صَبَرُوا তারা ধৈর্য ধরেছে تَحِيَّةً অভিবাদন حَسُنَتْ উত্তম হয়েছে।

‘তাদেরকে পুরস্কার দেয়া হবে (জান্নাতের) কক্ষ তাদের ধৈর্যের প্রতিদানে। তাদেরকে সেখানে অভিবাদন ও সালাম দিয়ে অভ্যর্থনা

জানানো হবে। সেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে। বসবাস ও আবাসস্থল হিসেবে তা কতই না উত্তম।'

বলা হয়েছে 'তাদেরকে পুরস্কার দেয়া হবে (জান্নাতের) কক্ষ ।' যাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে তারা কারা ? তারা রাহমান- পরম করুণাময় আল্লাহর বান্দা। যারা পূর্বের আয়াতসমূহে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য ও গুণবলীর অধিকারী।

তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে , 'তারা যে ধৈর্যধারণ করেছিল তার প্রতিদানে।' এর থেকে বুঝা গেল রাহমান- এর বান্দাহদের যেসব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে এসব গুণাবলী অর্জন সম্ভব নয়, নফস- প্রবৃত্তির লাগামহীন কামনা- বাসনাকে দমন করে কঠোর সাধনার মাধ্যমে এ গুণাবলী অর্জন করতে হবে। দৃঢ় সিদ্ধান্ত ও প্রবৃত্তির উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ থাকলেই এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করা সম্ভব।

আল্লাহর নেক বান্দাহদের জান্নাতে সালাম ও শুভেচ্ছার মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানানো হবে। তাদেরকে এ অভ্যর্থনা জানাবে জান্নাতের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাগণ। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন :

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿73﴾

'যারা তাদের রব (প্রভুকে) ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জান্নাতের কাছে পৌঁছবে- আর জান্নাতের দরজাগুলো আগ থেকেই খোলা থাকবে- তখন জান্নাতের রক্ষীগণ বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক, তোমরা স্থায়ীভাবে থাকার জন্য জান্নাতে প্রবেশ কর।' (৭৩ : যুমার)

রাহমান- এর বান্দাহদের স্থায়ী আবাস হবে জান্নাত) জান্নাতের পরিচয়ে বলা হয়েছে حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا 'বসবাস ও আবসস্থল হিসেবে তা কতই না উত্তম।' ঠিক এর বিপরীত কথা বলা হয়েছে জাহান্নাম সম্পর্কে।' যে জাহান্নাম থেকে রাহমান- এর বান্দারা বাঁচতে চায়।

(إنها ساءت مستقرا ومقاما)

'বসবাস ও আবসস্থল হিসেবে এটি কতই না নিকৃষ্ট।'

নিকৃষ্ট আবাস- জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য রাহমান- এর বান্দাগণ তাঁর দরবারে আকুতি জানায় , শুধু আকুতিই নয় এর থেকে বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যসমূহ অর্জন করে। আর এভাবেই তারা উত্তম আবাস- জান্নাতের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে।

আল্লাহ তার প্রিয় বান্দাদের বৈশিষ্ট্য ও তাদের সর্বোত্তম পুরস্কার ও প্রতিদান ঘোষণার পর বলেন,

قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا.

‘বল! আমার প্রভু তোমাদেরকে পরোয়া করে না যদি তোমরা তাকে না ডাক। তোমরা মিথ্যা বলছ। অতএব শীঘ্র তোমরা সম্মুখীন হবে অনিবার্য শাস্তির।’

এ আয়াতের তাফসীরে ইবন কাসীর রহ. বলেন:

لا يبالى ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه، فإنه إنما خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بكرة وأصيلا (فقد كذبتم) أيها الكافرون (فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا) فسوف يكون تكذيبكم لزاما لكم يعنى مقتضيا لعذابكم وهلاككم ودماركم فى الدنيا والأخرة.

যদি তোমরা (আল্লাহর) ইবাদত না কর তাহলে তিনি তোমাদের কোন পরোয়া করেন না। কেননা তিনি তাঁর ইবাদত ও তাঁর একাত্মতা স্বীকারের জন্য এবং সকাল সন্ধ্যায় তার পবিত্রতা বর্ণনার জন্য বিশেষ সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন।

হে কাফেররা (তোমরা মিথ্যা বলছ) আর তোমাদের এ মিথ্যাই তোমাদেরকে আখিরাতে শাস্তি এবং দুনিয়ায় ধ্বংস ও বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেবে। (তাফসীরে ইবন কাসীর খঃ ৩ পৃঃ ৩৩০)

এ আয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছে আল্লাহ যে বান্দাহদেরকে তার একক প্রভুত্ব ও নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে বাস্তব জীবনে তাঁর দাসত্ব মানার জন্য আদেশ করেন। এটি এ জন্য নয় যে , তিনি এর প্রয়োজন বোধ করেন। বরং আল্লাহ তার গোটা সৃষ্টির আনুগত্য ও দাসত্ব থেকে মুখাপেক্ষীহীন। আল্লাহকে মানা ও তাঁর দাসত্ব ও গোলামী করা মানুষেরই দায়িত্ব, এতে তাদেরই কল্যাণ দুনিয়াতে ও আখিরাতে।

সূরায়ে ফুরকানের শেষাংশে রাহমান- এর বান্দাদের যেসব গুণ ও বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করা হয়েছে সংক্ষেপে সেগুলো হলো :

১. বিনয় ২. ধৈর্য্য ও সহনশীলতা ৩. তাহাজ্জুদ আদায় ৪. জাহান্নামের ভয় ও তা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা ৫. অপব্যয় ও

কৃপণতা না করা ৬. শির্কমুক্ত থাকা ৭. যেনা ব্যভিচার ও হত্যার সাথে জড়িত না হওয়া ৮. তাওবা করা ৯. মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকা ও অর্থহীন কাজকে এড়িয়ে চলা, ১০. কুরআনের আয়াত অনুধাবন করা ও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। ১১. স্ত্রী ও সন্তান যেন আল্লাহর অনুগত হয়- এ জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করা।

আল্লাহ এসব গুণাবলী অর্জন করে আমাদেরকে জান্নাতের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার তাওফিক দিন।

সমাপ্ত